গ্রেডিং সিস্টেম প্রসঙ্গে

আনোয়ার হাসান

প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য গ্রেডিং সিস্টেম প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল ঐ সিস্টেমে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বস্বীকৃত অতি উন্নত এই পদ্ধতিটিই যে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সে বিষয়ে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের বিশেষজ্ঞরা বহু আগেই তাদের নিশ্চিত মত প্রকাশ করেছেন (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অবশ্য দেশে দেশে এখনো ভিন্নতা আছে)। কিন্তু এই সিস্টেম প্রবর্তনের শুরুতেই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট আরো অনেকের মনে সিস্টেমটি সম্পর্কে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রতাই (এ দেশের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতো) মূলত দায়ী নতুন সিস্টেমে মূল্যায়নের সিদ্ধান্তটি পরীক্ষার ঠিক আগের মুহূর্তে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অবহিত করলে তাদের অনেকেরই পক্ষে তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া যে সম্ভব নয় তা শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কেন বুঝতে পারেননি জানি না।

আমার জানা মতে, বছর দুয়েক আগেই গ্রেডিং সিস্টেম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তা হলে তখনই কেন এ সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়নি, সিস্টেমটির রূপরেখা ঠিক করা পর্যন্ত বিলম্ব না করে তখনই ঘোষণা দিলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর এতোখানি মানসিক চাপ পড়তো না। গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে পহেলা অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত লেটার গ্রেডিং প্রবর্তন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকালে আমি অন্য কয়েকটি বিষয়সহ অনতিবিলম্বে ঐ প্রবর্তনের ঘোষণা দেওয়ার ওপর অত্যন্ত জোরালো সুপারিশ রেখেছিলাম। তখনো যদি ঘোষণা দেওয়া হোত তা হলেও মনে হয় শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা এতোটা 'পরীক্ষার আগে তড়িঘড়ি ঘোষণার' অভিযোগ তুলতো না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ (কে যে কর্তৃপক্ষ, উপরোক্ত কমিটি, নাকি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, না কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়—তা উপরোক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকালে বা পরবর্তী সময়েও আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি) নিজেদের প্রভু এবং শিক্ষার্থীদের (তাদের অভিভাবকদেরও) আজ্ঞাবহ মনে করেন বলেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। অবশ্য দীর্ঘসূত্রতা এবং আমাদের দেশের অভিনব ফাইল-ওয়ার্ক পদ্ধতিও এ জন্য অনেকাংশে দায়ী।

গ্রেডিং সিস্টেমের রূপরেখা ঠিক করার পরেও কর্তৃপক্ষ তা শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক ইত্যাদি সবার কাছে তা তুলে ধরার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। একটা দায়সারা গোছের ঘোষণা দেওয়া হয় মাত্র। এজন্য যে ব্যাপক প্রচার, ব্যাখ্যা ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল, কর্তৃপক্ষ হয় তা উপলব্ধি করতে পারেননি নতুবা ঐ কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে—এসএসসির রেজাল্ট বের হওয়ার পর প্রায় সবগুলো পত্রিকায় লেখা হলো যে, গ্রেডিং সিস্টেমে মূল্যায়ন করায় এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে চরম বিপর্যয় হয়েছে। অথচ আসল সত্য হচ্ছে, পুরোনো পদ্ধতিতে রেজাল্ট দিলে প্রায় ৮ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১ জনও বেশি পাস/ফেল করতো না। আবার বহু ছাত্রছাত্রীই এবং তাদের অভিভাবকরা) বুঝতে পারেনি তাদের রেজাল্ট কি হয়েছে। এমনকি ঢাকা শহরের নামকরা স্কুলের শিক্ষকদের মাঝেও এ নিয়ে ভ্রান্তি দেখেছি। এসব নিয়ে যখন স্বভাবতই পত্রিকায় বিরূপ সব মন্তব্য ছাপা হতে লাগলো, হঠাৎ করে তখন বোর্ডের কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দিলেন যে, গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করতে গিয়ে যদি ভুলটুল হয়ে থাকে তবে আগামীতে তা সংশোধন করা হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির রূপরেখা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। (সেখানে কারা ছিলেন আমি ঠিক জানি না, তবে ধারণা করছি শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত কমিটি)। অবশ্য ঐ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তারা কিছু শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও সবগুলো বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা করেছেন। সুপারিশমালা তৈরি করার জন্য উপরোক্ত কমিটি সময় নিয়েছে প্রায় পাঁচ মাস। এমনি অবস্থায় বোর্ড কর্মকর্তারা উক্ত সংবাদ সম্মেলনে হঠাৎ করে কেন 'ভুলটুল হয়ে থাকে' বলে বিভ্রান্তিকর ঘোষণা দিয়ে গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষক সবার মনে আরো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন, তা আমারে বোধগম্য নয়। সঠিক প্রচার ও ব্যাখ্যার অভাবে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য নব প্রবর্তিত গ্রেডিং সিস্টেমটি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও ব্যাখ্যা দেওয়াই যে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, মনে হয় এখনো বোর্ডের কর্মকর্তাদের ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সে বোধোদয় হয়নি। এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য এখনো অনেকেরই সদ্য প্রবর্তিত গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তি রয়ে গেছে।

গ্রেডিং পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, পরীক্ষার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতার (যা পুরোনো পদ্ধতিতে ছিল) নিরসন করা এবং পরীক্ষকদের ভিন্নতা থাকার কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়নে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা যথাসম্ভব ক্রমিয়ে আনা (পুরোপুরি দূরীভূত করা কখনই সম্ভব নয়)। আমাদের পুরোনো পদ্ধতিতে প্রথম/ দ্বিতীয়/ তৃতীয় ইত্যাদি প্লেস পাওয়ার জন্য অনেক পরীক্ষার্থীর (এবং নামকরা স্কুলগুলোর) মধ্যে একটা চরম প্রতিযোগিতা ছিল। এ জন্য তাদের অনেকেই (অভিভাবক এবং অনেক সময় স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতায়) যে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতো এবং বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী যে অর্থের বিনিময়ে ঐ অপকর্মে সহায়তা দান করতো তা ছিল ওপেন সিক্রেট। আবার একজন মেধাবী পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র একজন কড়া পরীক্ষকের কাছে পড়ায় সে কম নম্বর পেয়েছে এবং অন্য একজন অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র একজন সদাশয় পরীক্ষকের কাছে পড়ায় সে বেশি-নম্বর পেয়েছে আমাদের পুরোনো পদ্ধতিতে এমনি অবস্থা ঘটার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। গ্রেডিং পদ্ধতিতে যে ঐ বৈষম্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় তা কিন্তু নয়, যা হয় তা হচ্ছে ঐ বৈষম্যের মিনিমাইজেশন।

মূল লক্ষ্য একই হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গ্রেডিং সিস্টেমের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—অনেক দেশে প্রতিটি বিষয়ে লেটার গ্রেড এবং সেই সঙ্গে গ্রেড পয়েন্ট (জিপি) ও গড় গ্রেড পয়েন্ট (জিপিএ) দেওয়া হয়; আবার অনেক দেশে শুধুমাত্র প্রতিটি বিষয়ে লেটার গ্রেড দেওয়া হয়, কোনো জিপি (এবং সে কারণে জিপিএ) দেওয়া হয় না। আবার পাঠ্যক্রমের ভিন্নতাও আছে দেশে দেশে। আমাদের দেশের পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ, নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ এবং ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ রয়েছে এবং এসএসসি পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীকে সর্বমোট ১১টি পত্র (৯টি বিষয়) বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হয়। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ঐ পর্যায়ে (যেমন ইংল্যান্ডের 'ও' লেভেল) বাধ্যতামূলক বিষয় বলে

কিছু নেই এবং সর্বমোট পত্র (বা বিষয়) বলেও নির্দিষ্ট কিছু নেই, একজন পরীক্ষার্থী যে কোনো সংখ্যক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে (তবে অন্তত ৫টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করা হয়)। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পদ্ধতি একটি দেশের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাই আমাদের গ্রেডিং পদ্ধতিটি হুবহু বিদেশের মতো হয়নি বলে যারা বিরূপ মন্তব্য করছেন, তারা ভুল করছেন বলেই আমার মনে হয়।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য সুপারিশমালা তৈরি করার লক্ষ্যে পূর্বোল্লিখিত ৩০/৯/২০০০-০১/১০/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকের মধ্যেই উপরোক্ত 'নিজস্ব প্রেক্ষিত'-এর ধারণা খুব একটা ছিল না বলেই আমার মনে হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা গ্রেডিং পদ্ধতির ওপর একটি ওয়ার্কিং পেপার উপস্থাপন করেন এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সবগুলো বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা, কয়েকজন কলেজ-অধ্যক্ষ, স্কুলের কয়েকজন প্রধান শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক মূলত ঐ প্রতিবেদনের আলোকে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত আলোচনায় দুটি বিষয় প্রাধান্য পায়- (১) পরীক্ষার্থীদের কোন নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেডিং করা হবে, পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর (যাকে ইংরেজিতে 'র' স্কোর' বলে) নাকি উক্ত নম্বরকে প্রমিত নম্বরে (স্টানডার্ড স্কোর) রূপান্তরিত করার পর প্রাপ্ত নম্বর; (২) গ্রেডের স্তরের সংখ্যা এবং ঐগুলোর ব্যাপ্তি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ওয়ার্কিং পেপারে (এবং আলোচকদের প্রায় সবার আলোচনায়) স্টানডার্ড স্কোরকে বাংলায় আদর্শায়িত নম্বর বলা হয়েছে যা সঠিক নয় (স্টানডার্ড-এর বাংলা অর্থ প্রমিত ...

নয়)। পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরকে প্রমিত নম্বরে রূপান্তরিত করার বেশ কয়েকটি সূত্র আছে। উপরোক্ত ওয়ার্কিং পেপারে যে সূত্রটির সুপারিশ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

$$\frac{প-পগ}{পবি} = \frac{প্র-প্রগ}{প্রবি}$$

যেখানে, প=পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর ('র' স্কোর);
পগ = 'র' স্কোরের গড়;
পবি = 'র' স্কোরের প্রমিত বিচ্যুতি;
প্র= প্রমিত নম্বর;
প্রগ = প্রমিত নম্বরের গড়;
প্রবি = প্রমিত নম্বরের প্রমিত বিচ্যুতি;

উপরোক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সবাই (প্রায় ৫০/৬০ জন, সঠিক সংখ্যা আমার মনে নেই।) একবাক্যে প্রমিত (যাকে তারা আদর্শায়িত বলেছেন) নম্বর পদ্ধতিকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে ঐ পদ্ধতি আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে সঠিক নয়। (যদিও আমি ভালোভাবেই অবগত ছিলাম যে, পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই প্রমিত নম্বর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়)। এ কারণে আমি 'র'স্কোরকে সরাসরি লেটার গ্রেডে রূপান্তর করার পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য দৃঢ় অভিমত দেই। কিন্তু অন্য কেউ আমার প্রস্তাব সমর্থন করেননি এবং শেষ পর্যন্ত আমি প্রমিত নম্বর পদ্ধতির সুপারিশে 'নোট অব ডিসেন্ট' দেই। কেন আমি এতো দৃঢ়ভাবে প্রামত নম্বর পদ্ধতির বিরোধিতা করেছি তা (কয়েকদিন পরে) লেটার গ্রেডিং প্রবর্তন কমিটির আহ্বায়কের কাছে লিখিতভাবে দেই। এর কিছুটা অংশ এখান তুলে দিচ্ছি (যা থেকে 'র' স্কোর পদ্ধতির পক্ষে আমার দৃঢ় অবস্থানের কারণ স্পষ্ট হবে)- 'অনেক বিলম্বে হলেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি প্রর্বতন করার যে উদ্যোগ নেওয়া

> এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার এতোদিন পরেও অনেকের মধ্যে প্রবর্তিত গ্রেডিং সিস্টেমটি সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়ে গেছে। ঐ ভুল ধারণা দূর করতে হলে কর্তৃপক্ষের অবশ্যই অনতিবিলম্বে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হয়েছে তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অবশ্যই একটি উত্তম পদক্ষেপ। তবে শুধুমাত্র উক্ত দুটি পরীক্ষায় নয়, স্কুলের সকল শ্রেণীতে তা যতো শীঘ্র সম্ভব চালু করা দরকার। যদি ২০০১ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়, তবে স্কুলের শ্রেণীগুলোতে ২০০২/২০০৩ সালের মধ্যেই তা করা প্রয়োজন। একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এসএসসি, এইচএসসি এবং স্কুলের সকল শ্রেণীর গ্রেডিং পদ্ধতি অভিন্ন হতে হবে। উপযুক্ত একটি প্রমিত নম্বর (স্টানডার্ড স্কোর) পদ্ধতিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হলেও, বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুলের শ্রেণীসমূহে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে একটি সহজ পদ্ধতিতে (যেমন 'র' স্কোর) গ্রেডিং সিস্টেম করা বাঞ্ছনীয়।'

উক্ত কর্মশালার সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ঐ কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিবেদন ও নীতিমালা বিবেচনা করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে আবার একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ১৪/২/২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় ২০/২৫ জন (সঠিক সংখ্যা মনে নেই) অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ঐ কর্মশালায় যোগ দিয়ে আমি অত্যন্ত বিস্মিত এবং আনন্দিত হলাম যখন দেখলাম, উপরোক্ত সাত সদস্যের কমিটি প্রমিত নম্বর পদ্ধতি বাদ দিয়ে 'র' স্কোর পদ্ধতি সুপারিশ করেছেন এবং এবার অংশগ্রহণকারী সবাই কোনোরকম প্রতিবাদ না করে তাতেই সম্মতি দেন। এরপর যে বিষয়টি নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেয় তা হচ্ছে গ্রেডসমূহের ব্যাপ্তি। উপরোক্ত কমিটির সুপারিশ ছিল ছয়টি গ্রেড, যেগুলোর ব্যাপ্তি ...

৬৯ থেকে ৭৯ নম্বর; সি-৫৭ থেকে ... ডি-৪৫ থেকে ৫৬ নম্বর; ই-৩৩ থেকে ... এবং এফ-৩২ এবং এর নিচে। ... বিশ্ববিদ্যালয় একজন অধ্যাপক এ ধর... তীব্র বিরোধিতা করেন এবং ... ব্যবধানযুক্ত গ্রেডস্তরের পক্ষে জোরা... রাখেন। আমার যতোটা মনে ... সুপারিশকৃত গ্রেডগুলোর ব্যাপ্তি ৫/... মতো, যেমন এ+-৯৫ থেকে ১০... থেকে ৯৫ ইত্যাদি ইত্যাদি। ... অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ... ব্যাপ্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছি... আমার কাছে এতো কম ব্যবধানের গ্রে... দূরের কথা উপরোক্ত সাত সদস... সুপারিশকৃত গ্রেডগুলোর ব্যাপ্তিও সা... হয়নি। আমি তখন এভাবে গ্রেড ও তা... সুপারিশ করি এ+ - ৮০ থেকে ১০০ ... ৬০ থেকে ৭৯ নম্বর, বি-৪৫ থেকে ৫৯ ... ৩৩ থেকে ৪৪ নম্বর এবং এফ-৩২ ... নিচে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ম... তিনজন (একটি বোর্ডের চেয়ারম্যান... কলেজের অধ্যক্ষ এবং একটি স্কুলে... শিক্ষক) আমার উক্ত সুপারিশকে সমর্থন ...

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে (এবং অন্য ... বিশ্ববিদ্যালয়ে) পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রথমে ... পরীক্ষক পৃথকভাবে মূল্যায়ন করেন, ... নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অপরজন ... বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ দুজন পরীক্ষকের প্রদে... যে সব পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরদ্বয়ের মধ্যে ... এর বেশি ব্যবধান থাকে তাদের উত্তরপ... তৃতীয় একজন পরীক্ষকের কাছে পাঠানে... তারপর যে দুজন পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্ব... মধ্যে ব্যবধান কম থাকে তাদের প্রদত্ত নম্ব... গড় করে একজন পরীক্ষার্থীর নম্বর চূড়ান্ত ... হয়। আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে দেখে... ২-১% থেকে শুরু করে ৫০% (কখনও ... বেশি) পরীক্ষার্থীর খাতা তৃতীয় পরীক্ষকের ... পাঠাতে হয় (অর্থাৎ প্রথম দুজন পরীক্ষকের ... নম্বরের মধ্যে ২০% এর বেশি ব্যবধান থা...

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ... মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে তারচেয়ে অনেক অ... বেশি ভিন্নতা রয়েছে স্কুল-কলেজের শিক্ষ... মধ্যে। এমতাবস্থায় একজন খুব কড়া পরী... এবং অন্য একজন খুব সদাশয় পরীক্ষকের ... এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় এ... পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের ব্যবধান ২০% ... এরকম) হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। অবশ্য বিষ... ওপরও এ ব্যবধান কিছুটা নির্ভর করবে (যে... অংকে কম হবে, বাংলা ও ইংরেজিতে বে... হবে)। কিন্তু এক বিষয়ে একেক রকম ব্যাপ্তি... গ্রেড করাটা বাস্তবসম্মত নয়। এ ছাড়াও ... যুক্তিটির কথা মনে রেখে আমি উপরোক্ত গ্রেড... ও ঐগুলোর ব্যাপ্তি সুপারিশ করেছি তা হ... পুরোনো পদ্ধতিটির সঙ্গে 'সঙ্গতি রাখা'। পুরো... পদ্ধতিতে ৮০% ও এর বেশি পেলে লেটার ৬০... ও এর বেশি পেলে ১ম বিভাগ, ৪৫%-৫৯... পেলে দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৩৩%-৪৪% পেলে ... বিভাগ দেওয়া হোত। লেটারকে এ+, প্রথ... বিভাগের নম্বরকে এ, দ্বিতীয় বিভাগের নম্বরকে বি... তৃতীয় বিভাগের নম্বরকে সি এবং ফেল নম্বরকে ... এফ ধরে গ্রেড করাটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গ... মনে হয়েছে। ১৪/২/২০০১ তারিখের কর্মশালা... সবগুলো সুপারিশের আলোকে শিক্ষামন্ত্রণাল... চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে ... স্টানডার্ড স্কোর নয়, 'র' স্কোরকে গ্রেডে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি গৃহীত হয় এবং গ্রেডগুলোর ব্যাপ্তি ঠিক করা হয়েছে আমার সুপারিশের কাছাকাছি (এ+-৮০% ও এর ওপর, এ-৬০ থেকে ৭৯, বি-৫১ থেকে ৫৯, সি-৪১ থেকে ৫০, ডি-৩৩ থেকে ৪০, এফ-৩২ থেকে ০০)।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে সম্ভাব্য বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ (ও ঐগুলোর যুক্তিসমূহ) বিবেচনা করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় 'ভুলটুল হয়ে থাকে' বলে ঘোষণা দেওয়ার কোনোই যুক্তি নেই বোর্ড কর্মকর্তাদের। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার এতোদিন পরেও অনেকের মধ্যে প্রবর্তিত গ্রেডিং সিস্টেমটি সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়ে গেছে। ঐ ভুল ধারণা দূর করতে হলে কর্তৃপক্ষের অবশ্যই অনতিবিলম্বে ব্যাপক প্রচারের (অবশ্যই ব্যাখ্যাসহ) ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিশেষে যে বিষয়টি উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে আমাদের বর্তমানের অতি নিকৃষ্ট প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা একটি অতি সাধারণ পদক্ষেপ মাত্র। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো হচ্ছে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদান পদ্ধতির আধুনিকায়ন ঐগুলোর অবস্থা এতো খারাপ যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই মেধার প্রকৃত বিকাশ হয় না, বিদ্যার গলাধকরণ হয় মাত্র। শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য যে প্রজ্ঞা ও সদিচ্ছা দরকার এবং যে সব সুচিন্তিত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, আমলাতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দ্বারা তা কতখানি সম্ভব জানি না।